বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী

সন ১৮৯৮

প্রণেতা

স্বামী বিবেকানন্দ

তথ্যসূত্র

History of the Ramakrishna Math And Mission

স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৫৭

Rules and Regulations of the Ramakrishna Math Belur, 1898

ডঃ রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ক১) এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজের মুক্তি অর্জনের জন্য এবং শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ কর্তৃক নির্ধারিত পথে, সর্বতোভাবে জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। নারীদের জন্যও অনুরূপ একটি মঠ স্থাপিত হবে।

ক২) নারীদের মঠও পুরুষদের মঠের একই নীতিতে পরিচালিত হবে। শুধু এই পার্থক্য থাকবে যে, নারীদের মঠে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং পুরুষদের মঠে সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ক৩) হিমালয়ের কোনো উপযুক্ত স্থানেও এমন দুইটি মঠ স্থাপিত হবে এবং সেগুলি একই নীতিতে পরিচালিত হবে।

ক৪) নারীদের মঠ পরিচালনার জন্য যতদিন না উপযুক্ত নারী কর্মী পাওয়া যায়, ততদিন তা দূর থেকে পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হবে। পরবর্তীকালে নারীরাই নিজেদের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ক৫) শিক্ষার অভাবে ধর্মসংঘগুলির অবনতি ঘটে।তাই সর্বদা শিক্ষার চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

ক৬) ত্যাগ ও সংযমের অভাবে ভোগবিলাস সংগঠনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে; অতএব ত্যাগ ও সংযমের আদর্শকে সর্বদা উজ্জ্বল রাখতে হবে।

ক৭) সংগঠনের ভাবধারার প্রচারই তার প্রাণশক্তিকে দৃঢ় রাখে। তাই প্রচারকার্য হতে কখনোই বিরত থাকা উচিত নয়।

ক৮) এইধরনের মঠ সারা পৃথিবীতে স্থাপন করতে হবে। কিছু দেশে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রয়োজন, আবার অন্য কিছু দেশে কিছুটা বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যেরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এইভাবে, জাতি ও ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজ নিজ পথে, তাদের যে বিশেষ অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় তা পূরণ করে, আধ্যাত্মিকতার জগতে নিয়ে যেতে হবে।

ক৯) ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তার। যতক্ষণ না খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়, ততক্ষণ ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে আধ্যাত্মিকতা অসম্ভব। তাই তাদের খাদ্য উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

ক১০) মঠ সমাজ সংস্কারের দিকে খুব বেশি মনোযোগ দেবে না, কারণ সামাজিক দুঃস্থতা বা কুসংস্কার সমাজদেহের এক ধরনের রোগ। যদি সেই দেহকে শিক্ষা ও খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্ট করা যায়, তবে এই কুসংস্কার আপনাতেই দূর হয়ে যাবে।

অতএব, সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে আওয়াজ তোলার পরিবর্তে, সমাজদেহকে পুষ্ট করাই এই মঠের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ক১১) চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকলে মানুষ কোনো কিছুতেই সফল হতে পারে না। এই চরিত্রবলহীনতাই আমাদের বাস্তবজ্ঞানের অভাবের একমাত্র কারণ।

ক১২) আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসই চরিত্র গঠনের একমাত্র উপায়। অতএব, এই মঠের প্রতিটি কার্যকলাপ ও শিক্ষায় এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ক১৩) শিষ্যের উচিত গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। তেমনি, যদি গুরুরও শিষ্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে, তবে শিষ্য কোনও অগ্রগতি করতে পারে না। গুরুর যদি শিষ্যের উপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে শিষ্যের শক্তি প্রকাশ পায় এবং শিষ্যের বিশ্বাসের ফলস্বরূপ গুরুর শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

ক১৪) এই মঠের সমস্ত কার্যকলাপ সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে পরিচালিত হবে, এবং যদি সর্বসম্মতি না থাকে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

ক১৫) যে যে ব্যক্তি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করে নিষ্কামকর্ম, ভক্তি, যোগ এবং জ্ঞান – এইগুলির মধ্যে যে কোন একটি বা দুটি বা

সবকয়টির অভ্যাসের দ্বারা জীবনযাপন করতে চান; যাঁরা সৎচরিত্রের অধিকারী; যাঁরা ঈর্ষামুক্ত এবং মঠ-প্রধানের আদেশ-অনুসারে এবং গুরুর নির্দেশ-অনুসারে সাধ্যমতো কাজ করতে প্রস্তুত – তাঁদেরকে এই মঠের সদস্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক১৬) মঠের সদস্যরা দুইভাগে বিভক্ত হবেন : নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। যাঁরা তরুণ বয়স হতে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছেন এবং সারাজীবন সেই অবস্থায় থাকবেন তাঁরাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

ক১৭) যাঁরা ব্রহ্মচর্য ব্রতে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু বর্তমানে আবার পবিত্রতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবং সন্ন্যাসব্রতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন – তাঁদেরকেও মঠের সদস্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক১৮) যেসব ছেলেকে তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক স্বেচ্ছায় এই মঠে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাবেন অথবা যারা অনাথ, তারা এই মঠে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষিত হবে, কিন্তু সদস্য হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তারা বিবাহ করবে কি না, তা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে।

ক১৯) আপাতত শুধুমাত্র সৎ পরিবার থেকে আগত হিন্দু ছেলেরাই ভর্তি হবে।

ক২০) ধর্ম ছাড়া কোনো ধারণা ভারতে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং এ ধরনের সকল কাজ ধর্মের মাধ্যমে প্রবর্তন করতে হবে।

ক২১) এখন লক্ষ্য হল ধীরে ধীরে এই মঠকে একটি সার্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা।এখানে দার্শনিক ও ধর্মীয় চর্চার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এটি প্রথমে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যান্য বিভাগগুলি ধীরে ধীরে পরবর্তীতে যুক্ত করা যেতে পারে।

ক২২) ভারতবর্ষে সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ হলো নিম্নবর্গ এবং উচ্চবর্গের মধ্যে বিস্তৃত ফারাক। এই পার্থক্য দূর না করা হলে কোনো কল্যাণের আশা নেই। অতএব, সকল স্থানে প্রচারক পাঠিয়ে সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্মীয় ভাবনা প্রচার করতে হবে।

ক২৩) অতএব, যারা বর্তমানে মঠের দায়িত্বে আছেন বা ভবিষ্যতে থাকবেন, তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই মঠকে কখনোই বাবাজির ঠাকুরবাড়িতে পরিণত হতে দেওয়া যাবে না।

ক২৪) অবশ্য ঠাকুরবাড়ি কিছু অল্পসংখ্যক লোকের কিছু মঙ্গল সাধন করে; কিছু মানুষের কৌতূহলও মেটায়। কিন্তু এই মঠের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হবে।

খ১) পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য, তিতিক্ষা এবং চরম পবিত্রতা – এইগুলিই হল আশ্রমের ভাইদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার একমাত্র উপায়।

খ২) সর্বোপরি, একটি সাধারণ আদর্শ হল একতা বজায় রাখার মূল বন্ধন।

খ৩) আমাদের আচার্যদেব নাম ও যশের জন্য আসেন নি। আমরা তাঁর ভৃত্য; নাম ও যশ উপভোগের জন্য তাই আমাদেরও কোনও আকুল আকাঙ্ক্ষা নেই। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল তাঁর আদেশগুলি পালন করা, নিজেরা পবিত্র জীবন যাপন করা, এবং অন্যদেরকে তা করতে শিক্ষা দেওয়া।

খ৪) এই মঠের প্রত্যেক সদস্যের অনুভব করা উচিত যে তার প্রতিটি কর্মে যেন সে আচার্যদেবের মহিমা প্রকাশ করতে পারে এবং সে যেখানেই যাক বা যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, সে শ্রীরামকৃষ্ণের একজন প্রতিনিধি এবং তার মধ্যে দিয়েই লোকে আচার্যদেবকে দেখবে।

খ৫) এই আদর্শটি মনে সর্বদা জাগিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে কোনো ভুল পদক্ষেপ ঘটবে না।

খ৬) অনুগত্য বাস্তবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। তাই এমনকি জীবননাশের ভয় ত্যাগ করেও আদেশ পালন করতে হবে। ভয়ই সকল দুঃখের মূল কারণ। ভয়ই সর্ববৃহৎ পাপ। সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর করা উচিত।

খ৭) অন্যের পিছনে নিন্দা করা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ভেঙে ফেলার প্রধান কারণ। তাই কেউ তা করবে না। যদি কারও কোনো ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকে, তবে সেটি শুধুমাত্র তার কাছে একান্তে ব্যক্তিগতভাবে বলা উচিত।

খ৮) আচার্যদেবের ভৃত্যদের বা তাঁদের ভৃত্যদের মধ্যে কেউই খারাপ নয়।যদি তারা খারাপ হত, তবে কেউ এখানে আসতে পারত না।তাই, কাউকে খারাপ ভাবার আগে প্রথমেই ভাবতে হবে–"আমি কেন অশুভ দেখি?"

খ৯) প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই হল মহান কর্ম সম্পাদনের এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র উপায়। বলার এই যে, উপরে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ রূপায়ণের জন্য মঠের প্রধান যে কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন, তাঁর উত্তরসূরিও যেন কেবলমাত্র সেই পথই অনুসরণ করেন।

খ১০) ঐক্যই অগ্রগতির প্রধান মাধ্যম এবং শক্তি অর্জনের একমাত্র পথ। অতএব, যদি কেউ চিন্তা, বাক্য বা কর্মের দ্বারা এই ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা করে, তবে সমগ্র সংঘের অভিশাপ

তার উপর পতিত হবে এবং সে এই পৃথিবী ও পরবর্তী জীবন–উভয়ই হারাবে।

খ১১) যদি কেউ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তাকে পুরো সংঘের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করতে হবে এবং সংঘ যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা বিনীতভাবে মেনে নিতে হবে।

খ১২) অপরাধ করার পর যদি কেউ নিজের দোষ অস্বীকার করে এবং সংঘের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে সে এই পৃথিবী ও পরবর্তী জীবন–উভয়ই হারাবে।

খ১৩) সংঘ হল তাঁরই দেহ এবং এই সঙ্ঘে তিনি সর্বদা উপস্থিত।

খ১৪) সংঘ সমবেতভাবে যা আদেশ দেবে, সেটাই আচার্যদেবের আদেশ; যে সংঘের উপাসনা করে, সে আচার্যদেবেরই উপাসনা করে; এবং যে সংঘকে অমান্য করে, সে আচার্যদেবকেও অমান্য করে।

তৃতীয় অধ্যায় ধর্মবিশ্বাস

গ১) যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলিকে সংগ্রহ করে কেবল সেইগুলিকেই একমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ রূপে গ্রহণ করি, তাহলে তাঁর মহান ভাবনা ও আদর্শ এবং আমাদের আজীবনের শ্রমের একমাত্র ফল এই হবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করব এবং ইতিমধ্যেই নানা বিবাদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত এই সমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলব।

গ২) অতএব, আমাদের চিরন্তন শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদকেই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ ও প্রচার করা হবে; এরই সাথে, যেমন প্রাচীন কালে গীতা ছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হবে বৈদিক তত্ত্বের সর্বাধুনিক ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

গ৩) অন্য ভাবে বলতে গেলে, শংকরাচার্য ও অন্যান্য সকল ভাষ্যকার একটি গুরুতর ভুল করেছিলেন যে তাঁরা ভেবেছিলেন যে সমগ্র বেদ একটি মাত্র তত্ত্বই প্রকাশ করে। ফলে, যেসব বৈদিক বাক্য তাঁদের নিজস্ব মতবাদের বিরুদ্ধে গেছে, সেগুলিকে কৃত্রিমভাবে তাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা প্রকৃতপক্ষে সেই বাক্যগুলির উপর অত্যাচারই করেছেন।

গ৪) যেমন প্রাচীন কালে গীতার বাণীপ্রদাতা ভগবানই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি পরস্পরবিরোধী মতগুলিকে আংশিকভাবে মিলিয়ে একটি সঙ্গতি স্থাপন করেছিলেন, তেমনি কালের প্রবাহে

এই মতভেদ যখন বিশাল আকার ধারণ করল, তখন সেই বিরোধ চিরতরে নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

গ৫) অতএব, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর আলোকে বেদ ও বেদান্ত পাঠ না করলে এবং তাঁর জীবনের মাধ্যমে সেগুলিকে না দেখলে, এগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষমতা কারুরই নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নিজের জীবনে প্রতিপাদন করে দেখিয়েছেন যে ধর্মগ্রন্থের যেসব বক্তব্য প্রথম দর্শনে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, সেগুলি আসলে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জন্য নির্দিষ্ট এবং ধাপে ধাপে আত্মিক উন্নতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত। এই শিক্ষার ফলে সমগ্র বিশ্ব ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে তার সকল বিরোধ ও মতভেদ ভুলে এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবে।এই ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায় সেই ক্রমবর্ধমান প্রভাববলয় দেখে, যা এই কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।

গ৬) মোদ্দা কথা এই যে, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র এতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল, আর শ্রীরামকৃষ্ণরূপ আলোক সেগুলিকে আবার উদ্ভাসিত করেছে।

গ৭) অতএব এটা স্পষ্ট যে, নতুন শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, বরং সেই প্রাচীন, চিরন্তন শাস্ত্রগুলি থেকেই নতুন আলোক আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমাদের সেই শাস্ত্রগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।

গ৮) শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসমূহের সঙ্কলন, যেগুলি কিনা তাঁর নিত্য সহচরদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, সেগুলিকেই বেদের ব্যাখ্যা হিসেবে সম্মান জানানো হবে।

গ৯) শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা ও আদর্শের আলোকে বেদসমূহকে ব্যাখ্যা করতে হবে। সর্বোপরি এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সমস্ত শিক্ষাই বিশ্বকল্যাণের জন্য। যদি কেউ কখনও তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু শুনে থাকেন যা ক্ষতিকর বলে মনে হয়, তবে বুঝতে হবে সেটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্যই উদ্দিষ্ট ছিল, এবং অন্যদের জন্য তা যদি ক্ষতিকরও হয়, তবুও সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা উপকারীই ছিল।

গ১০) তাঁর সকল বাণীর মধ্য থেকে, কোনগুলো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য উদ্দিষ্ট এবং কোনগুলো সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য - এইভাবে সেগুলি আলাদা করতে হবে। এদের মধ্যে শুধু সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রযোজ্য শিক্ষাগুলিই গ্রন্থাকারে সংকলিত করতে হবে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবে।

গ১১) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শিক্ষাগুলি সংগ্রহ করে মঠের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণ করা হবে। এই শিক্ষাগুলির মাধ্যমে মঠের প্রচারকদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ

দেওয়া হবে যাতে তারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত উপদেশ দিতে পারেন।

গ১২) গুরুদেবের একটি নিজস্ব বাণী হলো - যারা কেবল একবার গিরগিটিকে দেখেছে, তারা শুধু তার একটি রঙই জানে; কিন্তু যারা সেই গাছের নিচে বাস করেছে, তারা গিরগিটির সব রঙ সম্বন্ধেই জানে। তাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনো বাণীকেই খাঁটি বলে ধরা হবে না যতক্ষণ না সেটি তাদের দ্বারা যাচাই করা হয়, যারা তাঁর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছিল এবং যাদের তিনি নিজহাতে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

গ১৩) জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম – এদের চরম নিখুঁত সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এমন অনন্য ব্যক্তিত্ব মানবজাতির ইতিহাসে পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। যার চরিত্র সবদিক থেকে একইভাবে পরিপূর্ণ তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যিকারের শিষ্য ও অনুগামী।

গ১৪) এমন একটি পরিপূর্ণ চরিত্র গঠনই এই যুগের লক্ষ্য, এবং প্রত্যেকের উচিত এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

ঘ১) আচার্যদেব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার পথ শিক্ষা দিতেন। অতএব, সাধনার জন্য একটিই সর্বজনীন পদ্ধতি হতে পারে না।

ঘ২) কিন্তু সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য অল্প একটু ভক্তি, ভজন এবং ব্যবহারিক অদ্বৈতবাদ - অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি করো—এইটুকু শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হবে।

ঘ৩) ঠাকুর যেসব সাধনপদ্ধতির শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেগুলো উপরোক্তভাবে সংকলিত করে মঠের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কারণ, কোন একজনকে শেখানো সাধনপদ্ধতি অন্যের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, এমনকি ক্ষতিকরও হতে পারে।

ঘ৪) এই মঠের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমন্বয়ে চরিত্র গঠন করা; এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যেসকল সাধনপদ্ধতি প্রয়োজন, সে সবগুলিই মঠের সাধনপদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হবে।

ঘ৫) তাই সকলের মনে রাখা উচিত যে, এই চারটির যে কোন একটিতেও যার ঘাটতি আছে, তার চরিত্র এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের ছাঁচে পুরোপুরি গঠিত হয়নি।

ঘ৬) এটাও মনে রাখতে হবে যে, যে ব্যক্তি পরের মঙ্গলচিন্তায় নিয়োজিত সে, যে কেবল তার নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর কর্ম করছে।

ঘ৭) এই প্রশিক্ষণের জন্য মঠকে প্রথমে চারটি বিভাগে ভাগ করা হবে - জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এবং যোগ; প্রত্যেক বিভাগে সেই বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হবেন।

ঘ৮) প্রতিটি বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাঠ করা হবে এবং অনুভবের সহায়ক সাধনাগুলি শেখানো হবে।

ঘ৯) তবে প্রতিটি বিভাগের সদস্যদের কর্ম-বিভাগের কিছু কাজ অবশ্যই করতে হবে।

ঘ১০) দেহই হল ধর্মলাভের প্রাথমিক যন্ত্র, তাই স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি সর্বদা মনোযোগ প্রদান করতে হবে। কিন্তু যদি কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধনের পথে দেহ নষ্ট হয়, তবে তা সবথেকে ভালো হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ১১) গীতার মতো শাস্ত্রসমূহ এবং স্বয়ং ভগবানও নিরর্থক কঠোর তপস্যার বিরোধিতা করেছেন। তাই সেগুলি পরিহারযোগ্য।তবে যেসব তপস্যা সামান্য দেহযন্ত্রণা দিলেও

অত্যন্ত উপকারী, সেগুলির অনুশীলন সকলেরই করা উচিৎ। নাহলে ভোগ প্রবেশ করবে এবং সম্পূর্ণ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ঘ১২) আমাদের লক্ষ্য ভোগও নয়, তপস্যাও নয়, যোগও নয়; আমাদের লক্ষ্য জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদ করা; আমাদের লক্ষ্য জ্ঞান অথবা ভক্তির প্রাপ্তি।

ঘ১৩) অতএব, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে এমন যেকোন উপায়কে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাবো।

ঘ১৪) প্রভু এখনো শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ ত্যাগ করেননি। কেউ কেউ এখনও তাঁকে সেই রূপে দর্শন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে উপদেশ পান। যদি ইচ্ছা থাকে, সকলেই তাঁকে দর্শন করতে পারে। যতদিন না তিনি পরবর্তী স্থূল অবতারে আবির্ভূত হচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর এই এই রূপ বর্তমান থাকবে। যদিও তিনি সকলের কাছে দৃশ্যমান নন, তবুও, এই সংঘে যে তিনি রয়েছেন এবং এই সংঘকে পরিচালনা করছেন, এ প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা। নাহলে এমন অল্প সময়ে, এই তুচ্ছ, অসহায়, নির্যাতিত কয়েকটি বালকের দ্বারা বিশ্বব্যাপী এত বিশাল একটি আন্দোলনের সূচনা সম্ভব হত না।

ঘ১৫) অতএব, এই সংঘে কেউ যদি এমন কোনো নতুন সাধনার পথ আবিষ্কার করেন, যা প্রভুর শিক্ষার বিরোধিতা করে না এবং উপকারী ফল প্রদান করছে বলে বোঝা যায়, তবে

সেটিও প্রভুর আদেশ হিসেবে গৃহীত, সম্মানিত ও অনুসরণীয় হবে।

ঘ১৬) কাম-কাঞ্চনের পাশাপাশি আর যেইটি আচার্যদেব বারবার ত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, তবে তা হল – 'ভগবান এতটুকুই মাত্র' এই বলে ঈশ্বরের অনন্তভাবকে সীমাবদ্ধ করা।

ঘ১৭) যে কেউ এইভাবে ঈশ্বরের অনন্ত ভাবকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করবে, সে ঘৃণার পাত্র এবং ঈশ্বরবিদ্বেষী।

ঘ১৮) সংগঠন যখন সীমিত থাকে তখন আধ্যাত্মিকতার গভীরতা ও তীব্রতা বেশী থাকে। যেমন কিনা একটি সরু নদীর স্রোত বেশী। কিন্তু একটি সার্বজনীন সংগঠনের ক্ষেত্রে, তার আদর্শসমূহের বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের গভীরতা ও তীব্রতা ধীরে ধীরে কমতে দেখা যায়।

ঘ১৯) কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই রামকৃষ্ণ-রূপে এমন সব ধারণার সমন্বয় ঘটেছে, যাদের গভীরতা সমুদ্রের চেয়েও বেশী, যাদের বিশালতা আকাশের চেয়েও বেশী। ইতিহাসের সব পূর্বকীর্তি এখানে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ঘ২০) এই ঘটনা এটি প্রমাণ করে যে, সর্বোচ্চমাত্রার ব্যাপকতা, বিশ্বজনীনতা এবং তীব্রতা কোন একজন মানুষের মধ্যে একইসঙ্গে থাকতে পারে; ঐ একই ছকে একটি সমাজও গড়ে তোলা সম্ভব; কারণ সমাজ তো কেবল ব্যক্তিদের সমষ্টি মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়   ভক্তি

৬১) ভক্তিচর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি যেগুলি প্রাচীনযুগে শেখানো হতো (যেমন ভগবানের সেবা, নামজপ, ভক্তিগীতি করা ইত্যাদি) বা আধুনিক যুগে যেগুলি শেখানো হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে যেগুলি শেখানো হবে – সে সবই আন্তরিকভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে সাবধান থাকা প্রয়োজন যে – কেবল ভক্তির দ্বারা চরিত্র গঠিত প্রায়শই হয় না। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন নৈতিক না হলে কেউ ভক্তির উপযুক্ত হয় না।

৬২) সকলের এও মনে রাখা উচিত যে কীর্তনের উন্মাদনায় লাফালাফি করে স্নায়বিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলা বা বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে যাওয়া, এগুলো ভক্তি নয়।

৬৩) ভক্তির তীব্রতার মাধ্যমেই যোগের উচ্চতম স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, শুধু লাফালাফি করা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া বা ভাবাবেশে নানা অলৌকিক দর্শন দেখা মানেই কেউ সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

৬৪) এটি ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত যে ঐ ধরনের অবস্থা ভক্তির দ্বারা উদ্ভূত সমাধি, না কি স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে তৈরি কোন মানসিক বিভ্রমজনিত অবস্থা।

৬৫) ভাবসমাধি অবস্থায় আচার্যদেব যে সব দর্শন পেতেন বা যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করতেন, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ধীরে

ধীরে পূর্ণ হচ্ছে। উপরন্তু, ঐ অবস্থায় তাঁর প্রতিটি উপলব্ধিই ছিল নিঃস্বার্থ, নৈতিক এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

৬৬) যদি কারো সেই ধরনের ভাব-সমাধি হয়, তবে বুঝতে হবে যে তা ভক্তির ফল। কিন্তু অপরপক্ষে যদি তা স্বার্থপর, অনৈতিক ও নিষ্ফল হয়, তবে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত এবং তার সেই রোগ থেকে আরোগ্যলাভের ব্যবস্থা করা দরকার।

৬৭) কর্তৃপক্ষের এই বিষয়েও বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত যাতে কোনো একটি বিশেষ সাধনপন্থা, যেমন ভক্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত প্রভাবশালী না হয়ে ওঠে এবং অন্য পন্থাগুলিকে দাবিয়ে দেয়।

৬৮) ভক্তিভাবের বিকাশের জন্য ভগবানের গুণগান ভক্তিসংগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করা হবে; সেক্ষেত্রে তাল, লয় ইত্যাদির প্রতিও যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়　　　　পূজাঘর

চ১) এই মঠের প্রতিটি সদস্য পূজার ঘরে প্রবেশ করার ও সেখানে পূজা করার অধিকারী হবেন।

চ২) শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি যে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে তাঁকে পূজা, ভোগাদি ইত্যাদি দেওয়া হোক। তাঁর স্মরণে আমরা এইগুলির সূত্রপাত করেছি।

চ৩) যোগ, ধ্যান, ভজন, জপ ইত্যাদিই হলো তাঁর মুখ্য উপদেশ। বর্তমানে মঠে যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের কেউই বলেন না যে শ্রীরামকৃষ্ণ কাউকে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে পূজা বা ভোগ দিতে বলেছিলেন। শুধু জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি কিছু শিষ্যকে তাঁর রূপের উপর ধ্যান করতে বলতেন।

চ৪) আচার্যদেবের শিক্ষা অনুসারে কাজ করাই হলো তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃত উপায়।

চ৫) কাজেই, এই মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ধ্যান, ভজন প্রভৃতি উচ্চস্তরের অভ্যাসগুলি চর্চা করার ও উপলব্ধির জন্য, যা ভক্তি ও মুক্তির অনুকূল। আচার্যদেব এগুলিই প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর নিজ জীবনের দ্বারা চিত্রায়ণ করেছিলেন; যাতে কিনা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, এমনকি ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল পর্যন্ত এই আদর্শগুলির প্রচারিত হয়।

চ৬) যে ব্যক্তি, তা সে যে কোন উপায়েই হোক না কেন, শুদ্ধ চিত্তে তাঁর দেখানো পথ অবলম্বন করেন, এবং তিনি যদি একজন বৈরাগ্যবান ব্যক্তি হন, তাঁকে এই মঠের সদস্য হিসেবে নির্বাচন করা হতে পারে। তিনি আচার্যদেবকে ঈশ্বর, অবতার বা একজন সাধারণ গুরুরূপে গ্রহণ করেন কি না, তার কোন গুরুত্ব নেই।

চ৭) অন্যান্য বিষয়গুলি, যেমন মূর্তিপূজা ইত্যাদি, উপযুক্ত সম্মানের সাথে যথাযোগ্যভাবে পালিত হবে, কিন্তু সাধনার যে পদ্ধতি আচার্যদেব দেখিয়েছেন, সেটিই সর্বোচ্চ স্থান পাবে এবং সর্বাধিক প্রচেষ্টার যোগ্য হবে।

চ৮) অন্যভাবে বললে, সকলের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি ত্যাগ করে কেবলমাত্র মূর্তিপূজা ও ভোগাদি প্রদানেই ব্যস্ত থাকবেন, তিনি আচার্যদেবের নির্দেশিত সাধনপথকে অবজ্ঞা করবেন। তবে কেউ যদি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রাথমিক কর্তব্যের পাশাপাশি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য আচরণ পালন করেন, তবে কোনো ক্ষতি নেই।

ছ১) যখন মুসলমানরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে, তখন তাদের ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী ভারতে ষাট কোটি হিন্দু ছিল। এই হিসাবও অনেকটা কম করে বলা হয়েছে, বাড়িয়ে নয়; কারণ বহু সংখ্যক মানুষ শুধুমাত্র মুসলমানদের নির্যাতনের ফলেই প্রাণ হারিয়েছিল। অতএব, এটা স্পষ্ট যে হিন্দুদের সংখ্যা তখন ষাট কোটির চেয়েও বেশি ছিল – কোনো অবস্থাতেই তার কম ছিল না। কিন্তু আজ সেই হিন্দুরাই কমতে কমতে মাত্র বিশ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তার উপর, খ্রিস্টান শক্তির প্রাধান্য বিস্তার হওয়ার পর প্রায় দুই কোটি মানুষ খ্রিস্টান হয়ে গেছে এবং প্রতি বছর এক লক্ষেরও বেশি মানুষ খ্রিস্টান হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, বিশেষভাবে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্যই করুণার প্রতিমূর্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

ছ২) আমাদের সমাজ জাতিভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। সব সমাজই কোনো না কোনোভাবে এরকম বিভাজনের উপর গঠিত। কিন্তু আমাদের সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজগুলোর কিছু পার্থক্য আছে।

ছ৩) সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে দুটি মহান শক্তি নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এই দুই মহাশক্তির মধ্যে সংঘাতই পৃথিবীর সমস্ত বৈচিত্র্য ও লীলার (কার্যকলাপের) সৃষ্টি করে। মানব সমাজেও এই দুটি শক্তিই অবিরত জাতিগত ভেদাভেদের বৈচিত্র্য সৃষ্টি

করছে এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাবে। এই জাতিবৈচিত্র্যের পাশাপাশি, অধিকারের ভেদাভেদও যেন মৃত্যুর ছায়ার মতো মানবসমাজের উপর আবির্ভূত হচ্ছে।

ছ৪) এই দুই শক্তির মধ্যে, একটি শক্তি অধিকারের ভেদাভেদকে বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করে; অপরটি তার বিরোধিতা করে এবং সেই ভেদাভেদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

ছ৫) বৈচিত্র্যই জগতের অস্তিত্বের মূল সত্তা; এবং এই জাতিপ্রথা, যা কিনা বৈচিত্র্যেরই আরেক রূপ, কখনোই ধ্বংস হবে না। অন্যভাবে বললে, বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যের উপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা ব্যক্তিবিশেষের কাজকর্মে ভিন্নতা থাকবেই। যেমন, কেউ সমাজ পরিচালনার উপযুক্ত, আর কেউ রাস্তার ধুলা ঝাড়ু দেওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্যই সকল সামাজিক কুকীর্তি এবং অশুভের মূল কারণ হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে সমাজ পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি জগতের সমস্ত উপভোগের উপর একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করে এবং রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া ব্যক্তি অভুক্ত অবস্থায় মারা যায়। আমাদের সমাজে যতগুলি জাতি বর্তমানে আছে, তার চেয়েও যদি আরও লক্ষাধিক জাতি সৃষ্টি হয়, তবে তা অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলের দিকেই নিয়ে যাবে। কারণ, কোনো দেশে যত বেশি জাতি থাকবে, তত বেশি শিল্প ও হস্তশিল্পের মতো জীবিকা থাকবে। কিন্তু জাতির সেই রূপটির বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই চলছে যে রূপ গঠিত হয়েছে

অধিকারের ভেদাভেদের ভিত্তিতে; এই রূপ যেন মৃত্যুর এক ছায়া। এই সংগ্রামে যে রাষ্ট্র যত বেশি পরাজিত হয়, তার দুর্দশা তত বেশি; আর যে রাষ্ট্র এই সংগ্রামে যত বেশি সফল হয়, সে উন্নতির সোপানে ততো উঁচু ওঠে।

ছ৬) সমাজে যাকে রাজনীতি বলা হয়, আসলে তা শুধু বিশেষ সুবিধাভোগী এবং বিশেষ সুবিধাহীন শ্রেণির মধ্যে এক সংগ্রাম; যে সংগ্রামের উৎপত্তি ভোগ করার অধিকারের পার্থক্যের জন্য।

ছ৭) অধিকারের ভেদাভেদের পার্থক্য হতে উদ্ভূত এই সুবিশাল সংগ্রামে পরাজিত হয়ে ভারত প্রায় এক জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হয়েছে।

ছ৮) অতএব, বিদেশি জাতির সঙ্গে সমতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা, যতক্ষণ না নিজের দেশের সমতা প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের পুনরুত্থানের কোনো আশাই নেই।

ছ৯) অন্যভাবে বলতে গেলে, মূল কথা হলো – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি জাতিতে বিভক্তিকরণ ব্যাপারটা নিজে দোষের নয়, বরং ঐরকম ভাগাভাগির ফলে অধিকার এবং সুবিধার যে পার্থক্য, সেটিই মহা অশুভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছ১০) অতএব, আমাদের লক্ষ্য জাতিভেদকে ধ্বংস করা নয়, বরং অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের জীবনের প্রধান

ব্রত হলো আচণ্ডাল সকলকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিকার অর্জনে সহায়তা করা।

ছ১১) ভারত আবার জেগে উঠবে, এবং মঠের এই কেন্দ্র থেকে যে বিশাল জোয়ার উঠেছে, তা এক প্রলয়ঙ্কর বন্যার মতো সমগ্র মানবজাতিকে প্লাবিত করবে এবং তাদের মোক্ষের পথে নিয়ে যাবে।এটাই আমাদের বিশ্বাস। আগামী যুগে একের পর এক যেসব শিষ্যপ্রজন্মের আগমন ঘটবে, তাদের মধ্যে দিয়ে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা আমাদের সর্বোত্তম সামর্থ্য অনুযায়ী কোমর বেঁধেছি।

ছ১২) এতে যারা যারা বিশ্বাস করবে, প্রভুর কৃপায় তারা অতুলনীয় শক্তি এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে।

ছ১৩) আজকাল পাশ্চাত্যের আলোকে ভারতভূমি কিছুটা হলেও আলোকিত হচ্ছে। বিশেষ অধিকারের প্রভেদ দূর করার জন্য যে পাশ্চাত্যের মহান দেশগুলিতে যে সুবিশাল সংগ্রাম এবং মরণপণ যুদ্ধ চলছে, তার বিবরণ, ধীরে ধীরে হলেও, আমাদের এই ঘুমন্ত জাতির কানে প্রবেশ এসে পৌঁছচ্ছে এবং আমাদের দেশের ভগ্নহৃদয় মানুষের মনে একটুখানি হলেও আশার আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা, আত্মার মহানতার কথা ধীরে ধীরে সোজা-বাঁকা নানা পথ ধরে এই দেশের শিরায় শিরায় প্রবেশ করছে। বঞ্চিত শ্রেণিরা তাদের

হারানো অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবি জানাচ্ছে। এমন সময়ে যদি শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেই শিক্ষা বা ধর্ম অবশ্যই ধ্বংস হবে।

ছ১৪) আমাদের সামনে তিনটি বিপদ : (১) ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সমস্ত জাতি একত্রিত হয়ে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ ধর্মের মতো একটি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করবে; (২) তারা কোনো বিদেশি ধর্ম গ্রহণ করবে; অথবা (৩) ভারত থেকে সমস্ত ধর্মীয় ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ছ১৫) প্রথমটি ঘটলে, এই প্রাচীন সভ্যতাকে স্থিতিশীল করার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। আজকের ভারত আবার তার শৈশব অবস্থায় ফিরে যাবে, তার সমস্ত অতীত গৌরব ভুলে দীর্ঘ সময় পরে খুব ধীরে ধীরে উন্নতির পথে সামান্যই এগোতে পারবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ভারতীয় সভ্যতা এবং আর্যজাতি খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, যে ব্যক্তিই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে, সে যে শুধু আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায় তা নয়, বরং সে আমাদের একজন শত্রু হয়ে ওঠে। ইতিহাসে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে মুসলিম শাসনকালে ধর্মত্যাগীরা কীভাবে শত্রু পক্ষে যোগদান করে, নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে কি বিশাল ক্ষতিই না করেছিল। তৃতীয় ক্ষেত্রে বিপদের মূল কারণ এই যে - যখন কোনো ব্যক্তি বা জাতির জীবনের মূল ভিত্তি ধ্বংস হয়, তখন সেই ব্যক্তি বা

জাতিও ধ্বংস হয়। আর্যজাতির জীবনধারার ভিত্তি হল ধর্ম। যদি সেটি ধ্বংস হয়, তবে আর্যজাতির পতন অনিবার্য।

ছ১৬) নদীর স্রোত নিজে থেকেই সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ বেছে নেয়। সমাজকল্যাণের স্রোতও ঠিক তেমনভাবেই নিজে থেকেই সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ ধরে প্রবাহিত হয়। অতএব, একটি সমাজকেও সেই পথেই পরিচালিত করা উচিত।

ছ১৭) ভারত বহু জাতির সমন্বয়ে পূর্ণ - দেশী ও বিদেশি উভয়প্রকারেরই। আর্য-ধর্ম এবং আর্য-ভাবধারা এখনও এদের অধিকাংশের মধ্যেই প্রবেশ করেনি।

ছ১৮) অতএব আমরা এই মহাবিপদ এড়াতে পারি সবার আগে ভারতবর্ষের আর্যীকরণের মাধ্যমে, সবার মধ্যে আর্যদের অধিকারসমূহ প্রদান করে, কোনো প্রকার ভেদাভেদ না করে সকলকে আর্য ধর্মগ্রন্থ ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পথে আহ্বান জানিয়ে। সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম, যে সকল জাতি উপনয়ন-আদি সংস্কারের অভাবে আর্যধর্ম থেকে হয়তো কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে, সেই সকল জাতিকে আবার উপযুক্ত সংস্কার প্রদান করে আর্যধর্মের পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। মানুষ কেবল সেই জিনিসেই আগ্রহী হয়, যাতে তার অধিকার থাকে। না হলে, অন্য জাতিগুলো আর্যধর্মকে শুধু ব্রাহ্মণের ধর্ম বলে মনে করে তা পরিত্যাগ করবে। ঠিক তেমনই, উপযুক্ত সংস্কার প্রদান করে

চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত জাতিকে এবং এমনকি ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিদেশি জাতিকেও সমাজে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে হিন্দু সমাজকেও প্রসারিত করতে হবে। তবে, এই কাজ ধীরে ধীরে করতে হবে। বর্তমানে কেবল তাদেরই সংস্কার প্রদান করা উচিত যারা শাস্ত্রমতে সংস্কার গ্রহণের যোগ্য, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত অজ্ঞতার কারণে তা থেকে বঞ্চিত।

ছ১৯) এইভাবে ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের প্রচার বিস্তৃত হবে এবং প্রচারকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

ছ২০) মুসলমান ও খ্রিস্টানদেরও হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য খুব বড়সড় প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তবে আপাতত তাদের উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ছ২১) এই জগতের আদর্শ অবস্থা সেইটি যখন সমস্ত বিশ্ব আবার কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিপূর্ণ হবে, যখন শূদ্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি বা ক্ষত্রিয়শক্তির আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না; যখন একটি শিশু জন্মলগ্ন থেকেই যোগশক্তি নিয়ে পৃথিবীতে আসবে; যখন আত্মিক শক্তি বস্তুগত শক্তির উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করবে; যখন রোগ ও দুঃখ মানুষের শরীর ও মনকে আর স্পর্শ করতে পারবে না; যখন ইন্দ্রিয়গুলি আর মনের বিরোধিতা করতে পারবে না; যখন পাশবিক শক্তির প্রয়োগ মানুষের স্মৃতি থেকে অতীতের কোন এক স্বপ্নের মতো সম্পূর্ণ মুছে যাবে; এবং

যখন ভালোবাসাই হবে এই জগতে সকল কর্মের একমাত্র চালিকাশক্তি, তখন এবং কেবল তখনই সমগ্র মানবজাতি ব্রাহ্মণ-গুণে গুণান্বিত হবে এবং ব্রাহ্মণ হয়ে উঠবে। কেবল তখনই জাতিভেদের অবসান হবে এবং প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা কল্পিত যে সত্যযুগ, সেই সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটবে। যে ধরনের জাতিভেদ প্রথা মানবসমাজকে ধীরে ধীরে এই পথে নিয়ে যায় কেবল সেই ধরনের জাতিভেদ প্রথাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যে ধরনের জাতিভেদ প্রথা জাতিগত ভেদকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করতে পারে, কেবলমাত্র সেই জাতিভেদ প্রথাই সাদরে গ্রহণযোগ্য।

ছ২২) একই বংশের মানুষের মধ্যে বা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকার কারণেই জাতির শারীরিক গঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইতিহাসেও এইটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে দুর্বল দেহসম্পন্ন কোনো জাতি কখনও মহান হতে পারে না। অতএব, হিন্দুদের শারীরিকভাবে অধিক শক্তিশালী করে তোলার উপায় খোঁজা আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

ছ২৩) বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আন্তঃবিবাহ বন্ধ করা, প্রতিটি বর্ণ যে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক যোগাযোগ বন্ধ করা এবং সর্বোপরি, কুলীনপ্রথার দ্বারা বিবাহের পরিধিকে আরও সংকুচিত করা, এই সবের ফলে রক্ত দূষিত হয়েছে এবং বীর্য ও প্রাণশক্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ছ২৪) এই কুফলের প্রতিকারের জন্য, প্রতিটি বর্ণের বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শুরু থেকেই প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

ছ ২৫) “আগুন যেমন সবকিছু গ্রাস করেও অক্ষত থাকে, তেমনি শক্তিশালী ব্যক্তিরাও বিভিন্ন কর্ম করা সত্ত্বেও নিষ্কলঙ্ক থাকে” - যে সম্প্রদায় শক্তি সঞ্চয় করেছে তারা সমাজকে নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও দিকেই নিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র উপায় হল পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা এবং বিদ্যার অর্জন। আমরা যত বেশি পরিমাণে এই শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চয় করব, তত বেশি আমরা সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হব।

ছ২৬) এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সম্প্রদায় তৈরি করা প্রয়োজন, যার প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে ভারতের অস্থি ও মজ্জায় প্রবেশ করবে এবং তাকে তার মরণশীল অবস্থা থেকে পুনর্জীবিত করবে।

ছ২৭) লোকনিন্দা, খাদ্যাভাব অথবা অপযশের ভয়ে সাধারণত মানুষ নতুন উদ্যোগ শুরু করার সাহস করে না, এমনকি যদি সেই উদ্যোগ সমাজের জন্য উপকারী হয় তাও। এছাড়া, কোনো সম্প্রদায় যত বেশি সময় ধরে কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে, তার জন্য নতুন পথ অনুসরণ করা তত কঠিন

হয়ে ওঠে। অতএব, এই অত্যন্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় হল অনেকগুলি নতুন উপনিবেশ স্থাপন করা, যেখানে মানুষ, সামাজিক আধিপত্যবাদ (এইটি জন্মগত সংস্কারের থেকেও বন্ধনের এক দৃঢ়তর রূপ) থেকে দূরে থেকে, নতুন উৎসাহ নিয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপনা করবে এবং নতুন শক্তিতে সমৃদ্ধ হবে। ভারতের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নেই।

ছ২৮) মধ্যভারতে, হাজারিবাগ এবং অন্যান্য জেলাগুলির কাছে বহু উর্বর, জলের ব্যবস্থাযুক্ত, স্বাস্থ্যকর জমি এখনও অতি সহজেই পাওয়া যেতে পারে। ঐ অঞ্চলে এক বিরাট জমি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং সেখানে একটি বড় কারিগরি স্কুল এবং ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় যেমন যেমন আবিষ্কার হবে, তেমন তেমনই মানুষ সেই উপনিবেশে বসতি স্থাপন শুরু করবে। তারপর তাদের যে কোনও ছাঁচে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়   মঠ পরিচালন নিয়মাবলী

জ১) এইটি স্থির করা হল যে এই মঠটিই কেন্দ্রীয় মঠ হবে। এই মঠের অধীনে থাকা অন্যান্য মঠ এই মঠের আইন অনুসারে পরিচালিত হবে।

জ২) শুধুমাত্র এই মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীগণই এই মঠ সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার অধিকারী হবেন। এখানে 'সন্ন্যাসী' এবং 'ব্রহ্মচারীগণ' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য এবং তাঁদের শিষ্যদের নির্দেশ করা হচ্ছে।

জ৩) সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যৌথভাবে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন।

জ৪) প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি, এক বা দুই বা ততোধিক ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

জ৫) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতিই পর্যাপ্ত হবে।
আপাতত পরবর্তী চার বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সহকারীদের, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের মতামতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও ক্ষমতা থাকবে।

জ৬) প্রত্যেক সন্ন্যাসী দুটি ভোট এবং প্রত্যেক ব্রহ্মচারী একটি ভোট দিতে পারবেন।

জ৭) তামাক ছাড়া সকল ধরণের নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার মঠে নিষিদ্ধ। সকলে একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে কথা বলবে।কারোর কিছুর প্রয়োজন হলে, ম্যানেজারকে সে সম্বন্ধে জানাতে হবে।

জ৮) ব্রহ্মচারীরা সন্ন্যাসীগণের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবেন।

জ৯) সকল ধর্ম, ধর্মপ্রচারকগণ এবং সকল ধর্মে পূজিত দেবদেবীদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

জ১০) যতদূর সম্ভব সকলকেই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। সকলকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

জ১১) ম্যানেজারকে দেখতে হবে যেন সকল সদস্য তাঁদের জিনিসপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং সঠিক সময়ে উপযুক্ত খাবার পান।

জ১২) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলেরই একটু ব্যায়াম করা উচিত।

জ১৩) মঠের প্রধান এবং তাঁর সহকারীকে দেখতে হবে যাতে ভোরবেলায় সকলেই যেন নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী জপ, ধ্যান, পূজা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি অনুশীলন করে।

জ১৪) সকলকে যথাসম্ভব একসাথে খাবার গ্রহণ করতে হবে। তারপর তাদের দুই ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হবে।

জ১৫) এরপর সকলকেই নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী শাস্ত্রপাঠ করতে হবে; একা অথবা দু-তিনজন মিলে এই পাঠ করতে হবে।

জ১৬) বিকেলে আবার একটি ক্লাস হবে যেখানে একজন পাঠ করবে এবং অন্যরা শুনবে।

জ১৭) সন্ধ্যায় আবার জপ, ধ্যান এবং স্তবগান ইত্যাদি হবে।

জ১৮) সমস্ত কাজ এবং কথোপকথন শান্ত ও নিঃশব্দভাবে করে যেতে হবে।

জ১৯) যাঁরা প্রচারের জন্য বাইরে যাবেন তাঁরা মূল মঠের মতো বিভিন্ন স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন। যাঁরা প্রচারের জন্য বা ভ্রমণের জন্য বাইরে যাবেন তাঁদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি চিঠি লিখতে হবে, যেখানে তাঁদের প্রচারকার্য অথবা ভ্রমণের প্রতিবেদন থাকবে। যাঁরা চিঠিপত্রের দায়িত্বে থাকবেন তাঁরা সাবধানে সেই চিঠিগুলি সংরক্ষণ করবেন, মঠপ্রধানের আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখবেন এবং সে লেখার কপি রাখবেন।

জ২০) দর্শনার্থীরা অতিথিশালায় বসে যাদের সাথে প্রয়োজন তাদের সাথে আলাপচারিতা ইত্যাদি করতে পারবেন।

জ২১) মঠপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কাউকে মঠে রাত কাটাতে দেওয়া হবে না।

জ২২) যে সমস্ত কাজ সকল সদস্যের একসাথে সম্পন্ন করার কথা, সেই সকল কাজের আগে ঘণ্টা বাজানো হবে।

জ২৩) প্রয়োজন অনুসারে এই নিয়মগুলিতে সংযোজন এবং পরিবর্তন করার অনুমতি প্রদান করা হল।

জ২৪) কোন কাজের দায়িত্বে থাকা কোন সদস্যকে যদি অন্য কোথাও যেতে হয়, সেক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব তাঁর সহকারীর উপর অথবা সহকারীর অনুপস্থিতিতে মঠের অন্য কোনও সদস্যের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

(স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত রামকৃষ্ণ মঠের প্রতীকচিহ্ন)